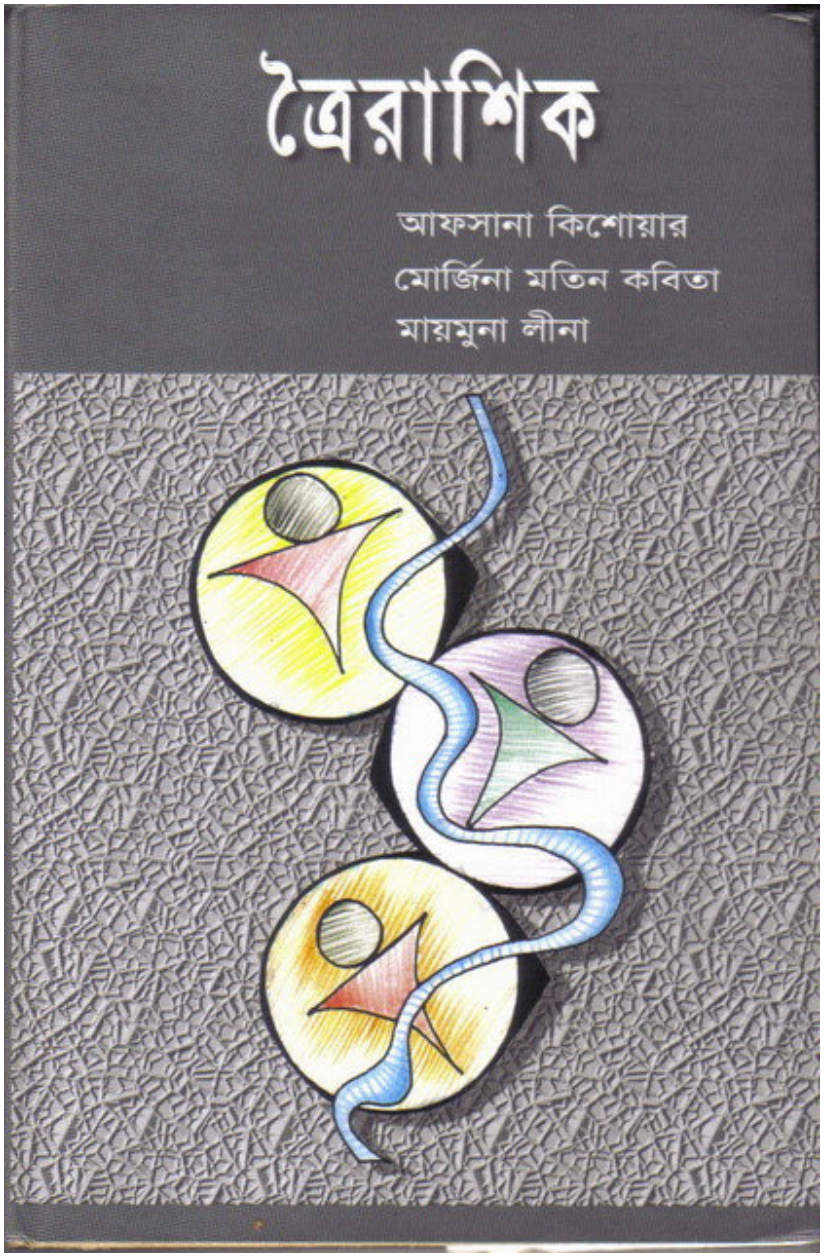


# সোনালী পুরাণ

আফসানা কিশোয়ার

আফসানা কিশোয়ার

মোর্জিনা মতিন কবিতা

মায়মুনা লীনা

# সোনালী পুরাণ

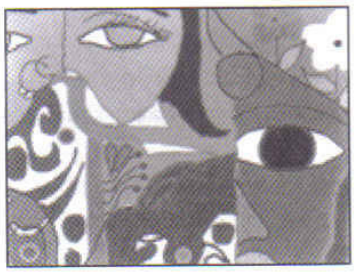

আ ফ সা না  কি শো য়া র

উৎসর্গ

*শাবানা শারমীন*

যার সাথে আমার এলোমেলো স্বপ্ননদী
বয়ে যায় প্রতিদিন।

**লেখক পরিচিতি:**

আফসানা কিশোয়ার। লোচন নামেই বেশি পরিচিত। ১৯৭৮সালে ঢাকাতে জন্ম। লেখালেখির বয়স অনেকদিন। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এবং ম্যাগাজিনে লিখছেন বেশ ক'বছর ধরে।

স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত বিষয় এবং লেখনীর কারণে তিনি ভিন্ন মাত্রায় স্থান করে নিচ্ছেন তরুণদের মাঝে ধীরে হলেও। সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর বিচরণ ব্যাংকিং পেশার সাথে বিরোধে জড়াবে না- এ আমাদের একান্ত কামনা।

**লেখকের অন্যান্য বই :**

**রোজনামচা: ভালোবাসা** (কাব্যোপন্যাস) - মে ২০০৪, শিখা প্রকাশনী
**নিষিদ্ধ ইশতেহার** (কবিতাগ্রন্থ)
**নস্টালজিয়া** (ছোটগল্প)
-সবুজ অঙ্গন সাহিত্য সংকলন ২০০৫
একুশে বইমেলা ২০০৫, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।
**শব্দোৎসব** (চিত্রকাব্য)- একুশে বইমেলা ২০০৫, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

## কাহিনী সংক্ষেপ:

তারুণ্য সবসময়ই ঝলমলে। কখনো তার নিজস্ব সবুজতা ছাড়িয়ে হয়ে উঠে সোনালী। সেই তারুণ্যের দোলাতেই বিয়াস ভালোবেসে ফেলে অতনু নামের এক আপাত কেয়ারলেস ছেলেকে। অথচ সে কথা সে জানাতে পারে না অতনুকে। সেই ব্যথা চেপে বিয়াস কি করে...
বন্ধুত্বের শ্রীমন্ডিত খেয়ায় শ্রেয়া, যে না কি নেশার জগতে সাবলীল চলাফেরা করে, নিজের বাবা'র অনৈতিক আচরণে সে ফিরে আসে জীবনের পথে। বিয়াসকে সে সার্বক্ষণিকভাবে পাশে পেতে চায়। বিয়াস কি পারে সেই চাওয়াকে পূর্ণতা দিতে!

পুনম, রাতুল, মাধবী, মিহির,বায়রন, তপু, তুতুল সবারই সমস্যা থাকে, সেইসব সমস্যা তারা কখনো ভাগাভাগি করে নেয় আবার কখনো একা একা জ্বলে।
এই কাহিনী তাদেরই ...

## ১.

ভয় ঠিক না। শিহরণ। হাত ঘামানো, গলা কাঁপা। ভীষণ পিপাসা। অতনুকে দেখলেই আমার এই উপসর্গগুলো একসাথে দেখা দেয়। গতরাতে প্রচন্ড ঝড় হয়েছে। অনেক বড় বড় গাছ উপড়েছে। যেখানে সেখানে জল থৈ থৈ। আকাশের মুখ এখনো ছাইরঙা মেঘে জড়ানো। আড্ডার জায়গা ফাঁকা। ক্লাশও তেমন হয়নি। চারুতে না গিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর সামনেই দাঁড়ানো সাব্যস্ত করি। অতনু আসবেই এমন কোন কথা নেই। তবু যদি দেখা হয় এই আশায় ঠায় চেয়ে রই।

বিশ মিনিট, পঁয়তাল্লিশ ...বাম পায়ের ভার ডান পায়ে দেই। ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেল। হালকা বৃষ্টি কেমন যেন সুড়সুড়ি দিয়ে গা বেয়ে নামছে। এক ঘণ্টা অপেক্ষার। তিনটার বাসে বাসায় যাব, প্লীজ অতনু তুমি আসো।

ঐ যে ঝাঁকড়া চুলের অসম্ভব রূপবান ছেলেটা আসছে। যে সবার, শুধু আমার কিছুতেই নয়। আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে চলে যেতে পারে যদি মুড খারাপ থাকে। আর বিশ কদম দূরে। আমি নিজের প্রবল গতির হার্টবিট শুনতে পাচ্ছি। চোখাচোখি হলো। ঈশ্বর মানুষের হাসি কেন এত সুন্দর হবে!

-কি রে বৃষ্টিতে ভিজিস কেন?
হাসি দেই। যেন এটাই আমার একমাত্র কাজ - বৃষ্টিতে ভেজা, এমন ভাব করে। অতনু আমার হাত ধরেছে। ভেজা হাত আর ঘাম মিলেমিশে একাকার।
কি নোংরা হয়ে আছে ছেলেটা! মাঝে মাঝে মন চায় কাঁচি দিয়ে চুলগুলো সব সাইজ করি। সার্ফ এক্সেল দিয়ে ওকে কাঁচতে পারলে বেশ হতো।

-এভাবে ভেজা মোটেও ঠিক হয়নি, অতনু বলতে থাকে।
না ভিজলে তোর দেখা পেতাম না- আমার ইচ্ছা করে বলি। বলি না। ভাব-ভালোবাসার কথা চারুকলার রেকর্ড নাম্বারধারী এ ছেলের মোটেও পছন্দ না। মেয়েরা তার জানের বিষ।
বিড়ি আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আজকাল বিড়ি টানা ধরেছে। আমি শুধু বন্ধু। আমার কোন লিঙ্গ পরিচয় নেই। মুখের বিস্বাদ ভাব সরিয়ে অতনুর বাড়িয়ে দেয়া আধ খাওয়া বিড়িতে টান দেই। আমার মা গায়ে যদি গন্ধ পায় ইউনিভার্সিটি আসাই বন্ধ করে দেবে।
-শুন তুই বাসায় চলে যা। আমার কাজ আছে।
অতনু এমনই। খুব বেশীক্ষণ সে তার মূল্যবান সময় কাউকে দেয় না।
রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এ যেতে থাকি তিনটার বাসের জন্যে। বৃষ্টি এখন ঝুম। লম্বা পা ফেলে জলদেবতার মতো হেঁটে যাচ্ছে আমার স্বপ্নপুরুষ অথবা স্রেফ বন্ধু। যতক্ষণ দেখা যায় রিকশা থেকে অপলক তাকিয়ে রই।

২.

কোন কিছুকে, কাউকে ভালো আমি বাসি না। আজ পর্যন্ত শুধু মেয়েদের কোন ছবি আঁকিনি। আসে না। বিয়াসের সঙ্গ ভালো লাগে। মেয়েটা এত চুপচাপ। মন দিয়ে আমার অর্থহীন কথা শোনে। তার মানে কি আমি অপরাপর পুরুষদেও মতোই মনোযোগ প্রত্যাশী! না, না এমন যেন না হয়, এ আমি কখনো হতে চাই না।
মাথাটা দারুন চুলকাচ্ছে। শিওর উকুন হয়েছে। এত এলামেলো থাকি! তবুও কেউ পিছু ছাড়ে না। নিজের ভন্ডামীতে নিজেই মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি।
ফিল্ম সোসাইটিতে আজকে 'বিউটিফুল মাইন্ড' ছবিটা দেখাবে। বেচারা বিয়াস! নিয়ে গেলেই পারতাম। একবার বললামও না। দেখি রাতে একবার ফোন করব।

নীলক্ষেতের হোটেলগুলোতে খাওয়া বেশ সস্তা। মা রাতে আক্ষেপ করবে কি খেয়েছি দুপুরে এ বলে। গাড়ি নেই না, কেন বাসে চড়ি এসব নিয়ে আরেক দফা হবে যদি জ্বর আসে। শরীরটা ভালো লাগছে না।

খেতে খেতে হোটেলের টেবিলের পানিতে আঁকিবুকি দেই। নারী মুখের মতো কি যেন উঁকি দেয়। ঝাপটা দিয়ে মুছি। জড়াবো না। কোথাও নোঙর ফেলব না। মানুষের এত এত কষ্টের মাঝে নিজের সুখ অন্বেষণ, বড্ড স্বার্থপরতা।

শরীরটা টান দিচ্ছে। বাসায় যেতে হবে। কাঁটাবন হয়ে যাওয়া ফরজ। ধুন্ নেই একটুও। কেনা দরকার। ধুনে দম না দিলে ব্রাশ চালানোটা সাবলীল হয় না। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাতে হবে। ঘুম, ঘুম, তিনদিন আগে লাস্ট ঘুমিয়েছি। মাকেও তো প্রায় তিনদিন দেখি না। হোম, মাই সুইট হোম...

৩.

বাসে আজকে ঠাসাঠাসি ভীড়। দু'টার বাস যায়নি। সিট পাবার কোন কারণই নেই। দাঁড়াই। কোনকিছুই খারাপ লাগছে না। অতনু কে দেখেছি যে! আহা বেচারা যেভাবে ভিজলো কি হয় কে জানে! জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতেও ভালো লাগে। সংসদ ভবনের রাস্তায় এই ঘোর বর্ষাতেও কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁকড়া মাথায় লালের ছটা। যেন আগুন নেভাতে জল ছুঁড়ছে কেউ, বৃষ্টির খেলাটা তেমনই লাগে। বিকেলে টিউশনিতে যাবার কোন মানে হয় না। অসহ্য! চরম গাঁইয়া বাপ মায়ের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়ে। থোড়া হিন্দি, সাম ইংলিশ আর একটু নাক সিঁটকানো বাংলা হচ্ছে এদের ভাব প্রকাশের ভাষা। নিজে ইংরেজীতে অনার্স পড়ছি তবু ইংরেজী ভাষাটা আমার না পছন্দের। 'মা' কে মা না ডাকলে তো মনই ভরে না।

নদীগুলো বর্ষায় প্রমত্তা হয়। আমি তো নদীই, বিয়াস নদী। আজকে হুলস্থুল আষাঢ়ের গান গা'ব ভাঙা গলায়। অতনুর ভাষায় অলটারনেটিভ ভয়েস, খুব রিচ ঠিকমতো ব্যবহার জানলে।

আমি পাতার মতো জলে ভিজি
আমি ময়ূরের মতো বর্ষায় নাচি
তুমি তা দেখ কি...

গীটার কাছে থাকলে গানটা হয়ে যেত। উফ্, হার্ড ব্রেক। ড্রাইভার মামা ঝালমুড়ির মতো আমাদের ঝাঁকিয়ে নিলেন।
ক্ষুধায় টক ঢেকুর উঠার উপক্রম। তার উপর বিড়ি। একেবারে কিম্ভূত। চারটায়ও পৌঁছব কি না কে জানে! বাসার রাস্তায় জল না জমলেই হয়। একাকী জীবন যাপন করার অভ্যাস মনের ভেতরটা আরও বেশী একা করে দিয়েছে বাসভর্তি ছেলেমেয়েদের কলকাকলীতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভীষণ টের পাই। হায়, আমার একলা দুপুর...

৪.

ছবি টবি দেখার আশায় গুড়ে বালি। রুটি সেঁকা জ্বর। মাথায় বরফ দেবার তোড়জোর চলছে। মা অলরেডি বাবাকে ফোন করে ফেলেছে। বলির পাঁঠা হয়েছে মুন গাধাটা। ধুনের লোভে রাত্রিযাপনের ধান্দা নিয়ে বাসায় ঢুকে এখন ফাঁপড়ে। আম্মা সমানে ধোলাচ্ছে।
-তুমি তো সুস্থ মাথার। আমার ছেলে ভিজতে চাইলো তুমিও তাল দিলে! কেমন বন্ধু তোমরা!যাও ওষুধটা নিয়ে আসো। বন্ধুর জন্যে এটুকু অন্তত কর।
কি রে ঘুম পাচ্ছে?
মাথা ঝাঁকাই।
-ঠিক আছে ঘুমিয়ে পড়।
আম্মা বেরোতেই ফোনের উপর ডাইভ দেই। একশ তিন এমন কোন জ্বর না। কেমন যেন একটু নেশা নেশা ভাব লাগে। এসব সময়ে ভীষণ তুতুলের কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে করে ঐ রহস্যময় চোখের দিকে তাকাই, কেমন শৈত্য তুতুলদি'র দু'চোখে। বরফ ঠাসা চোখ দুটোর দৃষ্টি পেলেই আমার জ্বর-তাপ উবে যাবে।

- হ্যালো তুতুলদি তুমি কেমন আছো?

: ভালো। তোমার কি হয়েছে?
-তুমি কেমন করে বুঝলে আমার কিছু হয়েছে?
: কিছু না হলে তুমি বিকেল ছ'টায় বাসায় থাকবে কেন?
-আমার ভীষণ জ্বর।
তুতুলদি তুমি কি আঁকছো?
-হ্যাঁ, রাক্ষসের ছবি আঁকছি। তুমি ঘুমাও অতনু। সুস্থ হলে দেখা হবে।

সুস্থ! সুস্থ কি আমি আদৌ হব? তুতুলের কাছে ফোন করাটাই তো আমার একধরনের অসুস্থতা। আমার চাইতে নিদেনপক্ষে সাত আট বছরের বড় একজন মানুষের প্রতি যে আকর্ষণ তার সংজ্ঞা বা নাম তো আমি নিজেই বুঝি না। মাথাটা কাজ করছে না। আসলেই ঘুমানো দরকার।

৫.

পারছি না কোনভাবেই চোখ মেলতে। রেকর্ড সংখ্যক স্টিক টানা হয়েছে আজকে, ছ'টা। প্রথমবারের মতো সেন্স ঠিকমতো কাজ করছে না। রাতুল, মিহির সবার কথা শুনতে পাচ্ছি। পুনমের গীটারের সুর ধরতে পারছি। কিন্তু নাটমন্ডলের সিমেন্ট করা জায়গাটা থেকে আমি উঠতে পারছি না।

- এই পুনম,তুই বিয়াসকে ফোন কর। ও এসে শ্রেয়াকে নিয়ে যাক।
- রাতুল দেখ ফোন করলে আবার কালকে আমার সাথে খ্যাঁক খ্যাঁক করবে।

আমি পুনমকে মানা করতে চাই। বলেও ফেলি রাতুল লাগবে না কারও আসা। আমি যেতে পারব।

মিহির খুব কড়া গালি দিয়ে বলে, 'শ্রেয়া হারামজাদি তুই চুপ কর। ধুন্ রাণী সাজবার মন চায় না! তোর কিসের এত দুঃখ বল তো!'

'দুঃখ' শব্দটা মাথায় রিলে হতে থাকে। বিয়াসের কাঁধে মাথা রেখে ওকেও জিজ্ঞেস করি ক্যাবে বসে,' তুই তো আমার বাচ্চা বেলার বান্ধবী, বল্ না বিযাস আমার কেন এত দুঃখ বিলাস?'
বিয়াস একহাতে আমার মাথা ধরে বসে আছে। মাঝে মাঝে বিলি কাটছে চুলে।
বন্ধু কি মা হতে পারে? জানি না। এই একজন যে বিনা প্রশ্নে আমার পাশে আছে সবসময়। শত নষ্টামী-অত্যাচার সয়ে কেবল বন্ধুই হয়েছে, কখনো ছেড়ে যায়নি।

বিয়াসের বাসার তিন গলি পরেই আমাদের খাঁচা বা বাসা। একটুও ইচ্ছে করছে না ঐ নরকে যেতে। নেশাটাই উবে যাবে। খুব ভয়ে ভয়ে বিয়াসকে বলেই ফেলি আমাকে ওদের বাসায় নিয়ে যেতে। ওর মুখে সেই ভরসার হাসি যেন বা ও এটা জানতোই। আমার দোদুল্যমান শরীরকে পরম মমতায় জড়িয়ে বিয়াস বসে থাকে। গাঁজার প্রতিক্রিয়ায় বহুদিন পর আবেগ উথলায়। চোখের কোণে অযাচিত বাষ্পের হুড়োহুড়ি টের পাই। আমি কি ছাই তখনো জানতাম আসন্ন রাতটা আরও কাঁদাবে আমায় ভালোবাসার ঘায়ে!

৬.

আড়াইদিন পর বাসা থেকে বের হলাম, শ্রেয়াকে আনতে তাও। আমার ভীষণ বোরিং লাইফে কোন কিছুই ঘটে না, ঘটাতে পারি না বিধায়। আড়াইদিন অতনু'র কোন খবর জানি না। ক্যাম্পাসে যাই না। শ্রেয়া আমার গুহাবাসে ছন্দপতন ঘটালো। এখন আমার কোলে মুখ গুঁজে ঘুমাচ্ছে। কি শিশুর মতো নিষ্পাপ ঘুম! কে জানে স্বপ্নে হয়তো কাঁদছে!

কত বছরের বন্ধু , এতদিনেও ওদের বাসায় সুখ দেখলাম না। একমাত্র ভাই ছিল ওর আশ্রয়, সেও প্রবাসী। ওর মা গত পরশু কি এক ওয়ার্কশপে পনেরো দিনের

জন্যে জার্মানী গিয়েছে। এই সুযোগে বোরহান সাহেব তার বর্তমান ফিঁয়াসে কে নিয়ে নির্দ্বিধায় বাসায় রাত কাটাচ্ছেন। বেচারা শ্রেয়া সহ্য করতে পারেনি। তাই আজকে এই বেসামাল গাঁজা টানা। রাতুলরা তো জানে না এই আপাত ধনীর দুলালী মেয়েটার ভেতরটা কি অদ্ভূত রকমের দারিদ্র্যে কুপোকাত! পুরো সার্কেলে একমাত্র আমারই জানা শ্রেয়াদের বাসার আদ্যোপান্ত।

অতনু কতদিন দেখি না তোকে! ইস্, তোকে যদি তুমি ডাকতে পারতাম! এটা কখনো হবার নয়। শ্রেয়ার মতো কষ্ট তো আমার নেই। তবু কেন যেন আমার গভীরের বিয়াস একদম চেতনাশূন্য হয়ে নিশ্চিন্তির ঘুম চাইছে। নেশা-টেশা আমার একদমই ভালো লাগে না। আমার যে শ্রেয়ার মতো মৃত্যু ঘুম কখনোই দেয়া হবে না তা বিনা সন্দেহে যে কেউ বলতে পারবে।

বাহিরে সন্ধ্যা উতরোনো রাত নামছে। বাবা-মা নানাবাড়ি। ছোট ভাই বোন যে যার রুমে মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। বৃষ্টি ধোয়া আকাশটায় কেমন যেন ছটফট করে তারা ফুটছে। এগুলো দেখলে কোন বেদনাবোধ কি সত্যিই কাজ করে!

'শ্রেয়া, উঠ্, খাবি না?' এসময় ওকে জাগানো কি মানুষের কাজ! খাওয়াতে না পারলে সারারাত যন্ত্রণা করবে। ক্ষুধা শ্রেয়া একদমই সহ্য করতে পারে না।
কি দুর্দান্ত ভালো একটা মেয়ে,এমন বাচ্চাকে রেখে কিভাবে পারে কোন বাবা অন্য নারীর দিকে তার সামনেই হাত বাড়াতে!
-না খেলে কি হবে?
-মাঝরাতে ক্ষুধা লাগবে।
-ক্ষুধা লাগলে কি হয়?
কথা আর বাড়ালাম না। এখনই না থামালে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলতেই থাকবে।
-কাঁদিস কেন?
আমার দিকে প্রশ্ন ছঁড়ে দিয়ে শ্রীময়ী হাসি দিলেন।
নিজে খেলাম। বন্ধুকে মুখে তুলে খাইয়ে, মুখ মুছিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছি। মাথায় ঘুণ পোকা-আড়াই দিন অতনু'র খবর জানি না।

৭.

না কেঁদে কি কোন উপায আছে? আমার মতো নেশাড়ু একটা মেয়েকে কেউ মুখে তুলে খাওয়ায়? এমন কোন ভালো কাজ করে আসিনি যে আমাকে আদর করে ভোজ দিতে হবে। এই মেয়েটা এত কম কথা বলে কেন? ওর ভাব বোঝাই দায়।

অসম্ভব সিগারেটের তৃষ্ণা পেয়েছে। বৃষ্টির জন্যে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কাঁথা গায়ে বিয়াসের গলা জড়িয়ে শুয়ে আছি। ওর গা থেকে কেমন মা মা গন্ধ বেরোচ্ছে। আমরা মেয়েরা কি একটু বেশি মাত্রায় স্পর্শ প্রিয়? হবে হয়তো। অবিশ্রান্ত আমার মাথায় বিলি কাটছে, যার অর্থ একটাই 'ঘুমিয়ে পড়'।

বিয়াসের হাত ধরি। বলেই ফেলি, দোস্ত আমার তো ঘুম আসবে না। ভাত খাওয়ার পর...এটুকু বলতেই বিয়াস আমাকে বেনসন আর লাইটার দেয়।

-আমি জানি তোর ক্ষতি করলাম। কিন্তু একদিনে তো শুধরানো সম্ভব না তাই দিলাম। চাপা গলায় বলতে বলতে বিয়াস কেঁদে ফেলে।

- তোর মনে পড়ে শ্রেয়া স্কুলে থাকেত আমরা স্মোকার- অ্যাডিক্ট এদের কেমন ঘৃণা করতাম! তুই কি সুন্দর তেলওয়াত করতি! কতদিন মুগ্ধ হয়ে তোর গান শুনেছি। সেই তুই...কেন? কেন?

এই কেন'র উত্তর আমার জানা নেই। যতক্ষণ নেশা ততোক্ষণই বিচ্ছিন্নতা, আমোদ। কর্পূর মেঘে ভাসা।

আধখাওয়া সিগারেট আঁধার জলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দেই। আমার কান্না বিয়াসের কান্না কোন মোহনা পাবার জন্যে ছুটতে থাকে একসাথে।

৮.

সার্কেলটাই অদ্ভূত - বয়স, সাবেজেক্ট, লিঙ্গ কিছুই এখানে ফ্যাক্টর নয়। শুধু ঢুকে যেতে পারলেই হলো, তারপর গা ভাসাও। গ্রুপই তোমাকে মিশার ধান্ধা বাতলে দেবে। তোমাকে কষ্ট করে ভিড়বার চেষ্টা চালাতে হবে না। বৃষ্টির মধ্যে আমি কোথায় কি কাজে যাচ্ছি তা শুনলে যে কেউ বলবে, "মুন, শালা তুই একটা পারফেক্ট গাধা।" আমি অতনুর দেয়া একটা খাম, বেশ বড় সাইজের, নিয়ে যাচ্ছি বিয়াসদের বাসায়। অতনু গাড়ি দিয়েছে যকন যেতে আর সমস্যা কোথায়!

অতনু-বিয়াস-শ্রেয়া সবার সাথে আমার পরিচয় পাবলিক লাইব্রেরীতে। এক একজন ফাটাফাটি পয়সাওয়ালার সন্তান। অতনু চারুতে, বিয়াস- শ্রেয়া ঢাবি তে ইংলিশে পড়ে। আমি মুন একটা সিম্পল বি.এ পাশ ছেলে। আমার বাসার সবাই এখনো গ্রামের অ্যাকসেন্টে কথা বলে। বৃষ্টি হলেই পানি ওঠে এরকম একটা বাসায় থাকি গাদাগাদি করে। সেখানে এদের সাথে বন্ধুত্ব!

অতনু'র সাথে কি অদ্ভূতভাবেই না পরিচয়! সেদিনও বৃষ্টি ছিল। পাবলিক লাইব্রেরীতে শর্টফিল্ম দেখে গেইটে দাঁড়িয়ে আছি, আর ভেজা ম্যাচ দিয়ে সিগারেট জ্বালানোর বৃথা চেষ্টা করছি। পাশ থেকে এসে কেউ একজন লাইটার জ্বালালো, ধরিয়ে দিলো সিগারেটটা। ধন্যবাদ জানানোর জন্যে মুখ তুললাম। অপূর্ব সুন্দর, যেন বা দেবতা জিউস - এরকম একজন ছেলের সাথে চোখাচোখি হলো। থ্যাঙ্কস বলতেই হাত বাড়ালো।
-আমি অতনু, আপনি?
-আমি মুনতাসির।
-অতবড় নাম কে ডাকে? মুন বলি?
প্রত্যুৎপন্নমতিতায় মুগ্ধ হয়ে সায় দিলাম। এরপর একবার দু'বার বারবার দেখা শাহবাগে। একসময় তুই সম্বোধন। সবার বন্ধু হয়ে গেলাম।

বিয়াসদের বাসার সামনে চলে এসেছি। ছিমছাম, কোথায় যেন একটা অঘোষিত টান টান স্বাধীন চিন্তার আভা এ বাসাটার সমস্ত অবয়বে।
কলিং বেল দেই। বিয়াস আসে।

-দোস্ত, অতনু এই মালখান তোমার লাইগা দিছে ।

শান্ত ভঙ্গীতে খামটা খোলে বিয়াস। একটা স্কেচ বের হয়। হাত থেকে বরফ ঝরছে, যে কপালে হাতটা রাখা সেই কপাল থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। নীচে ক্যাপশন 'ধুঁকছি মৌসুমী জ্বরে'।

-আমাকে ফোন করলেই পারতো।
বিয়াসের কথায় সায় দেই। হ্যাঁ ফোন অতনু করতে পারতো।
-বুঝলি না শিল্পী মানুষ, প্রকাশভঙ্গীতো আলাদা হইবই। কথা শেষ করে গ্যাঁট হয়ে বসি। বিয়াস ভেতরে গিয়েছে। নাশতা আসুক। খুব ক্ষুধা লেগেছে। সকালে ভাইয়া-ভাবীর ধুন্ধুমারে নাশতার কোন স্কোপ ছিল না।

বিয়াসের স্প্যানিশ গীটারটা টেনে নেই। আমার গীটারটা গতমাসে বিক্রি বরে দিয়েছি। গরীবের ঘোড়া রোগ! গান গা'বে ওয়াসার কেরানী রহিম মুন্সির ছেলে, যত্তসব!

## ৯.

ছেলেটা সুস্থ হলো কি না কে জানে! অতনু-যার তনু নেই, বানানটা পাল্টে দিলে এমনই দাঁড়াবে। অতনু'র চোখের ভাষা এত ওয়াইল্ড এন্ড স্ট্রেইট মাঝে মাঝে আমার ভয়ই হয়। তুতুল- নামটার মধ্যে যেমন নরম নরম ভাব আছে, আমার কঠিন হৃদয়টা প্রায়ই অতনু'র জন্যে তেমন কোমল হয়ে উঠতে চায়। দেই না। কত্ত ছোট একটা বাচ্চা ছেলে। জীবনের কঠিনতম বাস্তবতার বাঁকই এখনো দেখেনি। দুনিয়াটা পাল্টানোর স্বপ্ন দেখে। শ'কোটি টাকার পতি'র ছেলে বিড়ি টানে। হাসি পায় আবার মায়াও হয়। মানুষকে খুব ভালোবাসে অথচ জানে না হাল জমানায় অন্যেরা একে দুর্বলতা ভাবে।

নৈঃসঙ্গ্যের কালো হাতের সাথে জড়াজড়ি আমার বেশ ক'বছর। সেখানে ক্ষীণ ঝংকার বলতে এই অতনু। চোখে মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা, ভালোবাসার বোধের এক কঠিন ককটেল। ককটেল...হুঁ, ককটেল। ঠিক হ্যায় তবে হয়ে যাক মদিরা অতনু'র সুস্বাস্থ্য কামনায়।

ইজেলের সামনে তুলি হাতে ড্রিঙ্ক করতে বেশ লাগে। সাথে একটু কড়া সিগারেট। কয়েকটানে একটা রোগা চেহারা ভেসে ওঠে। অতনু'র। কি রে আমার ভাই হতে পারিস না! তোকে তো আমি একটু কষ্টও দিতে চাই না। কিন্তু প্রেমও দিতে পারব না। এই ছেলে তুই এই বাঁজা মেয়েটার কাছে কি চাস!

হাত আর চলছে না। চার পেগ ভদকা এমন কিছুই না। তবু কেমন যেন ঝিমঝিম লাগছে আজকে। অতনু এই পাঁচ নম্বর পেগ তোর দিদিয়া হব সেজন্যে...

সিডি প্লেয়ারে চাপ পড়ে। বেজে ওঠে রাগ 'বাতিয়া বানাও না হি বার' কি বলে ইকবাল বানু? আমাকে মদ খাবার বাহানা বানাতে নিষেধ করছে? জানি না। ফ্লোরেই শুয়ে পড়ি আজ রাতের মতো।

## ১০.

এত কম উপস্থিতিতে ক্লাশ জমার কোন কারণই নেই। এস.আই রোল কল করেই পনেরো মিনিট পার করলেন। শ্রেয়া সম্ভবত ঘুমিয়েই যাবে। আল্লাহ মালুম গত রাতে ও কি খেয়েছে। আরেকটু বেশি লোকজন থাকলে আমি পেছনের দরজা দিয়ে

কখন বের হয়ে যেতাম! জানালায় দু'টা ভেজা শালিক চুপ করে বসে আছে। এরাই আপাতত এস.আই স্যারের একমাত্র মনোযোগী শ্রোতা।

উফ্, বাঁচলাম। শ্রেয়ার হাত টান দিয়ে একবারে বের হয়ে আসি।

-কি রে পরের ক্লাশ করবি না?
শ্রেয়ার প্রশ্নে আমি বেশ চমকাই। ও কবে থেকে এত সিরিয়াস!
- না, আজ আর কোন ক্লাশ করব না। চল ডাকসু তে যাই।

ডাকসুতে ঢোকার আগেই চিৎকার শুনি 'বিয়াস এদিকে'।
আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। ফাঁকা মাঠে নিঃশ্বাস নেয়া দরকার। আমার সামনে অতনু, সুন্দর করে ছাঁটা চুল। ব্লু জিনস আর কাঁঠাল চাপা কালারের ফতুয়ায় 'ও' আজকে সবকিছুকে হার মানিয়েছে। আমি কুয়াশায় সারারাত ভেজা সোডিয়াম আলোর মতো আর্দ্রতা সারা মননে নিয়ে ওর কথা শুনি, শ্রেয়ার হাত শক্ত করে চেপে ধরে।
-বুঝলি তোকে খুঁজতেই আমি এসেছি।
অতনু'র এ কথায় আমি আবার নিজেকে হারাই।
-বায়রনরা লিটল ম্যাগাজিন বের করবে। লেখা প্লাস মাল্লু দু'টোই দরকার। তোর লাবড়া টাইপ কবিতা কিছু দিস। কিভাবে যে পত্রিকাগুলো এত গুরুত্ব দিয়ে তোর লেখা ছাপে আল্লাহ মালুম!
কথা ক'টা ছুঁড়ে দিয়েই অতনু হা হা হাসতে থাকে।
এই স্যাঁতস্যাঁতে বৃষ্টিতে আমার চারপাশে রোদের রেণু ঝরতে থাকে অতনু'র হাসিতে।
বন্ধু সেবা করতে এসেছে! লিটল ম্যাগ এর পুরো টাকা, প্রচ্ছদ সবই 'ও' করে দেবে জানি। আমাদের শুধু কষ্ট করে লিখতে হবে। অতনু'রে তুই কি কখনো বিয়াস নদীতে তোর ঐ স্বর্ণতনু ছোঁয়াবি না! অতনু চলে যাচ্ছে। যেতে যেতে বিল দিয়ে দিস চিৎকার করতে ভুললো না।

-তুই তো আমার হাতের হাড্ডি আলাদা করে দিলি।
সত্যিই শ্রেয়ার ফর্সা হাতে আমার আঙ্গুলের দাগ বসে গেছে।
-তোর এ কি অবস্থা রে বিয়াস? তুই কোথায় এ্যাঙ্কর করেছিস হারামজাদী!
শ্রেয়াকে আমার কি বলার আছে? কিসসু না।
-আমাকে বাঁচা দোস্ত। আমি শ্রেযকে বলেই ফেলি।
-তোর যা কন্ডিশন তাতে তুই ছাড়া তোকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না।

শ্রেয়ার কথাটা আমি বুকে তুলে নেই। আমি চাকমা নারীর মেয়ে। পরিশ্রম আমার অস্থি মজ্জায়। অধ্যবসায় দিয়ে দেখি অতনু আমায় কতটা মেনে নেয়,ভালোবাসে।

## ১১.

মাধবীর তীব্র হুল ফোটানো কথার জন্যেই এত বিপদ, তা মাধবী ঠিকই বোঝে। তবু ছাড়তে পারলো কই! যেমন আজকে প্রায় পনেরোদিন পর ওর তপুদের সাথে দেখা। মহসীন হলের তপু। সাবজক্টে আলাদা, আড্ডার সূত্রে গাঁথা। সেন্ট্রাল থেকে বেরোতেই তপুদের পুরো গ্রুপটার সঙ্গে মাধবী মুখোমুখি। এক কথা দু'কথার পর মাধবী হঠাৎ লক্ষ্য করে তপু মেয়েদের জিন্স পরা এবং গাধীর মতো ও সেটা এক দঙ্গল মানুষের সামনে বলে ফেলে। বলেই বুঝতে পারে খু-উ-ব খারাপ একটা কাজ করেছে।
মাধবী আসলে অস্তিত্ব জুড়ে এক ধরনের দহন অনুভব করে এই ধরনের লক্কা পায়রাগুলোকে দেখলেই। এই বয়সে রাজনীতির বদৌলতে এক্সেল হোন্ডা চালায় তপুরা। এদের নবাবীর জোগান দিতে গিয়ে মাধবীদের কত দিন মাস সেশন জটের থাবার নীচে শেষ! তার হিসাব কে রাখে!

অবশ্য ও এটাও বোঝে ওদের মানে মাধবী নিজে সহ অন্যান্য যারা নিজেদের সাধারণ ছাত্রছাত্রী বলে তাদের 'আমারটুকু নিয়ে' সরে যাবার মানসিকতাই পঞ্চগড় থেকে উঠে আসা তপুদের জিনস পরে ক্যাটওয়াক কি এক্সেলে চড়ার সুযোগ করে দেয়। মাধবী'র অবশ্য খুব নিজস্ব একটা মতামত আছে কলাভবনের বিভিন্ন সাবজেক্ট প্রসঙ্গে। ওর মনে হয় অলস বিষয় যেমন সংস্কৃতি ও পালি, দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামিক স্টাডিজ ইত্যাকার সাবজেক্টগুলোকে আধুনিকীকরণ করলে ভার্সিটির গ্যাঞ্জাম অর্ধেক কমে যাবে। কারণ এ ক'বছরে 'ও' এটা দেখেছে বেশিরভাগ ঝামেলা শুরু হয আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে।
মাধবী নিজের মনেই হাসে। ওদের পুরো ওলাকায় কোন ইন্টার পাস মানুষ নেই। সেখানেও ভার্সিটিতে পড়ে মেয়ে হয়ে। সেই মানুষ তো 'আমারটুকু' পেতে অস্থির হবেই।এইটুকু নিতে না পারলে 'উপজাতি' তকমার আড়াল থেকে কখনো বের হওয়া হবে না। বের না হলে ঠাঁই হবে শেষ পর্যন্ত কোন বিউটি পার্লারে। তাই তপুদের ঠেকানো বড়ই দরকার ওর মনের গহীনে এই ভাবনা খেলা করতে থাকে।

## ১২.

আইবিএ ক্যান্টিনের খাওয়াটা তুলনামূলকভাবে বেশ ভালো এটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে। যুগটা মোবাইলের। এই জেনারেশন সব ব্যাপারেই মোবাইল। ঝটপট এসএমএস এর কল্যাণে দুপুরে ওরা সবাই আজ বহুদিন পরে একসাথে হচ্ছে।

অতনু বেশ জোরেই গুণতে থাকে এক, দুই বলে। শ্রেয়া-বিয়াস একসাথেই ঢোকে। মুন সান কালারের গেঞ্জি পরে চারদিক আলো করে অতুন'র পাশে ধপাস। মাধবী'র গম ত্বক রোদের আঁচে সামান্য লালচে। তপু বাইকের চাবি বাকের ভাই স্টাইলে ঘোরাচ্ছে। রাতুল, মিহির বিষ খেতে এসেছে এমন একটা ভাব। সবশেষে বায়রন পুনমকে বগলদাবা করে। বায়রনের অসম্ভব কালো অবয়বে আলকাতরা কালারের গায়ের রঙে শাদা দাঁত বিকশিত সবাইকে একসাথে পেয়ে।

বায়রন তার কবিতা আবৃত্তির ঢঙে বলা শুরু করে - এবার আমি সিরিয়াস, একটা যুগান্তকারী লিটল ম্যাগাজিন বের করব, নামটা ঠিক করে ফেলেছি 'বে-পথু'। তোরা সবাই সাহায্য করলে এটা যে কোন ব্যাপারই না তা আমি খুব ভালো করে জানি।

-যুগান্তকারী মানে কি রে? তোর কি মনে হয় এই কাজ আগে আর কেউ করেনি? বাজারে শ'পাঁচেক লিটল ম্যাগাজিন অলরেডি আছে। দু'টার সংখ্যা বের হয়ে পটল তোলাই এসবের নিয়তি। আমি এসবে নেই।
একদমে কথাগুলো বলে মাধবী থামে।

-তোরা তো জানিসই আমার দলীয় কানেকশনই তোদের খরচ ওঠানোর জন্যে যথেষ্ট। আমাকে শুধু টাইমটা বলিস দুই চারটা অ্যাড-ফ্যাড যোগাড় করে দেয়া আমার জন্যে কোন ব্যাপারই না। আমি বলে দিচ্ছি কে কি করবে- অতনু প্রচ্ছদ করুক, বিয়াস অ্যাডিটিঙ, মুন প্রেসের দিকটা সামলাবে। রাতুল, মিহির আরও রাইটারদের যোগাড় করবে।
- তোর নেতাবাজি গেল না। তুই বললেই সবাই এটা ওটা করবে কেন?
মাধবী হিসহিস কের শব্দ ক'টা তপুর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেয়।

- শুন্, মাধু আমি রাজনীতি করি বলেই তোরা আমাকে ডাকিস। তোরা সবাই তো প্রোটোটাইপ। আমি তোদের গ্রুপে একমাত্র দলছুট, তোদের এই নিস্ততরঙ্গ জীবনে বিরিয়ানির স্বাদ। তোর মতো 'পাহাড়ী ছাত্র সংঘ' করে নাকের জল চোখের জল এক করার কোন ইচ্ছা আমার নেই। কি করতে পেরেছিস এক কাঁদা ছাড়া? পেরেছিস কল্পনা চাকমাকে ছাড়াতে? বেঁচে আছে না মারা গেছে জানতে?

- শুধু শুধু ঝগড়া করিস না তো। বিয়াস ধীরস্বরে বলে। টাকা আমাদেরসার্কেলে কোন ব্যাপার না। অর্গানাইজড ওয়েতে কাজ করাটাই বড় সমস্যা।

-রাইট। পুনম সায় দেয়।
- খরচ যা লাগে তার ফিফটি পার্সেন্ট আমি বিয়ার করব। ম্যেয়া হাত তুলে বলে।
- বাকীটা আমি। অতনু যোগ করে।
- তোদের সমস্যা নিয়েই লিখ না, মাধু। বায়রন মাধবীকে প্রস্তাব দেয়।
- আমি প্রেস চিনি, ভালো কাজ করে, এমন একটা প্রেস। রাতুল যোগান দেয় তথ্যের।
- প্রুফ রিডিং আমি করতে চাই। মিহির মিহি হাসি দিয়ে কথাটা বলে থামে।
- ব্যস্. প্রব্লেম সলভড॥ ইয়ার হাত তো মিলালো। তপু মাধবীর গালে টুসকি মারে। বিয়াস এমনিই গেয়ে ওঠে নীচু ভলিউমে- 'দেখা হবে বন্ধু কারণে আর অকারণে...'।

## ১৩.

দেখতে দেখতে অনার্সের প্রায় শেষ। চার বছরের অনার্স তো কম কথা না! আর মাস-দুয়েক হয়তো টেনে-টুনে ক্লাশ হবে। বিয়াস নিজেই অবাক হয় কেন 'ও' এখানে ভর্তি হয়েছিলো ভেবে। বাসার বড় সন্তান, আত্মপরিচয়ের সংকট, সব মিলিয়ে বাবা ওকে বাইরেই পাঠাতে চেয়েছে বারবার। ও যায়নি। কারণ বিয়াস ভালো করেই জানে ওদের আপাত চাকাচক্যটা বড়ই ঠুনকো। ওরা মধ্যবিত্ত। কিন্ত মুন যেমন লাগামছাড়া ধনী ওদের ভাবে ঠিক ততোটা নয়।
বর্ষা শরতের ধবধবে তোয়ালেতে আজকাল প্রায়ই মুখ লুকোচ্ছে। ফটোস্ট্যাট করার ফাঁকে আকাশ দেখা ছাড়া আর কি-ই-বা করার আছে! ক্যাম্পাসে কারও আড্ডা দেবার আপাতত সময় নেই। নোটস কালেকশনে সবাই প্রাণান্ত। এখানে ওখানে শুধু -
৪০১ এর নোট আছে? ও তোর কাছে ৪০৮ আছে? তাহলে আমার সাথে এক্সচেঞ্জ কর...এসব টুকরো কথার ওড়াওড়ি।
টিউশনি-ফিউশনি ছেড়ে সুবোধ বালিকার মতো পড়ার শীতল গুহায় বিচরণ। অতন-টতনু মাথা ছেড়ে লাপাত্তা।

শ্রেয়াকে  খুঁজে খুঁজে তুলে নিতে আজকাল শ্রেয়ার ক্লান্ত লাগে। মেয়েটা নিত্যনতুন নেশার পেছনে ছুটছে। কেন যেন মন শুধু বলছে - 'বিয়াস, আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরো।' কেন যে এত অস্থির লাগছে কে জানে! অবশ্য বোনটার জ্বর দেখে এসেছে সকালে।

নিউমার্কেট যাবে ভেবেছিলো, নীলক্ষেতেও যাওয়া দরকার। সব মূলতবী করে বিয়াস সন্ধ্যার আগে আগে বাসায় ঢোকে। ড্রয়িংরুম পার হতে না  হতেই মা ডেকে ওঠে, বিয়াস এদিকে আয়। তোর তৃণা আন্টি এসেছে।
মায়ের মুখে অনেকবার শোনা, ছবিতে দেখা সেই ওয়ান-টুতে থাকতে একবার দেখা, তারপর এই এতবছর পর দেখা।
- আন্টি কবে এলেন?
- পরশু।
-ওমা! নীলা, তোর মেয়ে দেখি তোকে ছাড়ানো সুন্দরী হয়েছে। তোর মেয়ের পেছনে তো পুরো ভার্সিটি আইন দেয়ার কথা!
বলেই তৃণা আন্টি হাসতে থাকেন। মা ও যোগ দেন।
বিয়াস লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকে যায় ফ্রেশ হবার অজুহাতে।

গায়ে পানি ঢালতে ঢালতে বিয়াসের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোথায় যেন একটা মধুর ষড়যন্ত্রের আভাস পায়।

১৪.

স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়ানো জীবন। তুতুল এখন আর কিছুতেই বিস্মিত বোধ করে না। স্নায়ুগুলো কেমন যেন মাত্রাতিরিক্ত ভোঁতা। ইদানীং রাত গভীর হবার সাথে সাথে ফোনে ব্ল্যাঙ্ক কল বাড়তে থাকে। এই শহরে একা নারীর মতো অসহায় কোন বস্তু সম্ভবত নেই। শুক্রবারটা তুতুল একদম নিজের মতো করে কাটায়। যতটা সম্ভব গৃহবন্দী থাকে।
তেমনই এক শুক্রবারে অতনু এলো দশটা পদ্ম নিয়ে।
-কি রে তুই?
-এলাম। তোমাকে দেখতে।
-আয় ভেতরে আয়। আমি তো ভাবলাম আমাকে বয়কট করেছিস।
-সামনে পরীক্ষা। অনার্স ফাইনাল। আর তিন মাস। তাই... বুঝই তো...
-বুঝলাম। তারপর খবর বল।
-তোকে একটা জিনিস দেখাই।
-এ কি  তুতুলদি! এ তো আমার স্কেচ! কবে করলে?
-তোর জ্বরের সময়।
-তুতুলদি শ্রেয়া তোমার কেমন বোন হয়? বলেছিলে, ইনফ্যাক্ট ওর মাধ্যমেই তো তোমার সাতে আমাদের ঘনিষ্ঠতা। ভুলে গেলে আবার একটু বলো না!
-আমার আম্মার মামামতো ভাই এর মেয়ে। কেন রে? মেয়েটার সাথে বহুদিন দেখা হয় না। কেমন আছে?
-ভালো না। শ্রেয়া ভীষণ ভুল পথে হাঁটছে। যেটা আমরা শখে করেছি ভালো আঁকার জন্যে কি মজা করার জন্যে, ও সেই নেশাকে আঁকচে বাস্তব থেকে পালাচ্ছে।
-কি খায়?
-কি খায় না তাই বলো! পরীক্ষা ড্রপ দেবার জন্যে মুখিয়ে আছে। বিয়াস ধরে বেঁধে...
-অতনু, বিয়াসকে আনলি না একবারও। বড় দেখার সাধ ছিল মেয়েটাকে।
- তোমাকে নিয়ে আমার ভাবনাগুলো তো এই সেদিন পর্যন্তও উল্টা পাল্টা ছিল। সত্যি কথা লজ্জায় আসিনি। শোন, তোমাকে যেটা বিশেষ করে বলতে এসেছি- আমরা 'বে-পথু' নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করছি। তুমি মডার্ন আর্টের উপর একটা লেখা দাও সচিত্রক। ম্যাগটা যেদিন প্রেস থেকে ফাইনাল আনব সেদিন সবাইকে নিয়ে তোমার এখানে আসব। কথা দিলাম।

ছেলেরা এমনও হয়! অতনু'র চলে যাবার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রই। এসব সময় খুব ফাইয়াজ এর কথা মনে পড়ে। কি উন্মাদনাময় ভালোবাসা! পুরো প্যারিস শহর আমাদের প্রেমের সেইসব চিহ্ন হয়তো এখনো বয়ে চলেছে। বাবা-মা;র আনন্দে ভেসে ফাইয়াজের সাথে সেই একপথে হাঁটার শপথ! তারপর! আহ্, তারপর....আমার যে ফার্স্ট সিম ক্যারেজের পর জরায়ু কেটে ফেলে দিতে হলো। সেই সাথে কেটে ফেললাম ফাইয়াজের সাথে একছাদের নীচে থাকার চুক্তিনামাও। আমার সব অস্তিত্বের চাইতে ওর কাছে জরায়ুর তাকাটাই মুখ্য হলো। ও নাতাশার হাত ধরে একদিন নতুন করে প্যারিস চিনতে শিখলো।
যে শহরে ফাইয়াজ, সে শহরে আমি কিভাবে...?
করিম-নাহার দম্পতির একমাত্র নন্তান এখন সুদূর ঢাকায় অতনুর স্কেচ করে আর মদ খায়। ইস্, যন্ত্রণা...

১৫.

-তোকে তো আমার বোঝানোর কিছু  নেই। আমাদেরই বরং তুই এতদিন বুঝিয়ে এসেছিস। তোর পছন্দ থাকলে বল্। তাছাড়া আমরা তো এখন বিয়েটা

দিচ্ছি না। তুই ধীরেসুস্থে পরীক্ষা দে। তারপর...
আম্মুর কথা থামতে আমি দম নেই।
-একটু সময় দাও।
-মা রে সবই তো বুঝিস। আমার উপজাতি পরিচয়, ধর্ম না পাল্টানো, তোদের মুসলমান বাবা, সব মিলিয়ে কোন সুস্থির জীবন তো তোদের আমরা দিতে পারিনি। তৃনার ছেলে খুব ভালো। তোর ভালো লাগবে।
আম্মু আমার রুম ছাড়েন আস্তে।

সমুদ্র সবার পছন্দের। কিন্তু সমুদ্রের বিশালতা ধরা দেয় না, বাঁধা যায় না। অতনুকে আমি কখনো বাঁধতে পারব না। নিজের ভেতরের একাকীত্বের যে পাখা টানা চলে তা কি শেষ হবে কারও ছোঁয়ায়? খুব বেশি স্নেহ খুঁজি। মা কে, বাবা কে সব বলা যায়। বলা যায় না বয়সের সংকটের কথা। তার জন্যে কি মনের মানুষ লাগে? তাহসান কি হবে আমার হৃদয়ের মানুষ?

বিয়াস রাত বারোটায় শ্রেয়াকে ফোন করে।
-হানি, আই আম্ গনা ক্রেজি।
-হোয়াটস আপ?
- গোয়িং টু গেট ম্যারিড।
-নো, নট নাউ।
-হোয়াই?
-ডোন্ট ওয়ানা লুজ ইউ নাউ। সকালে বিস্তারিত শুনব। শুভরাত্রি।
বিয়াস বুঝতে পারে শ্রেয়া খুব মন খারাপ করে ফোনটা রেখে দিয়েছে।
স্বপ্নের পুরুষ পরিবর্তনের আশা নিয়ে বিয়াস সে রাত্রিতে শান্তির ঘুম দেয় অনেক দিন পর।

১৬.

শ্রেয়া নিজের ভেতরে অকারণেই এক বিধ্বংসী জেদ টের পায়অ অথচ ওর বোঝা উচিৎ বিয়াস সারাজীবন ওর নেশাক্রান্ত দেহ মননের সেবার জন্যে অনূড়া পড়ে থাকতে পারবে না। শ্রেয়া বহু বহুদিন পর একটা কবিতা লেখে স্কচের গ্লাস হাতে-

জন্মাবধি ভালোবেসে যা-ই ছুঁতে গেছি
যাকেই রাখতে চেয়েছি তুলোয় মোড়ানো
আঙ্গুরের মতো যত্নে সে-ই হারিয়ে গেছে
গভীর ক্ষত রেখে। ছেলেবেলার লাল ঝুঁটি মোরগ
এক সন্ধ্যায় আর ফেরেনি। বাবা'র নিশ্চিন্তির বুকে
মুখ দিলেই পরনারীর ঝাঁঝাঁলো পারফিউমে
আমি পুড়ে ছাই হয়েছি কতবার!
বাবার ছোঁড়া অবহেলার এসিডে মা দিয়েছে
দু'হাত ভরে ঔদাসীন্য,
তুমি শুধু বন্ধুর ছায়া...

কি হবে এসব লিখে? শ্রেয়া ভালো করেই জানে ও কোনদিন যেমন কাউকে আটকাতে পারেনি তেমনি পারবে না বিয়াসকেও। টলতে টলতে শুধূ মনে হয় অতনু'র উপর প্রতিশোধ নিতে এমন সিদ্ধান্ত নিলো না তো বিয়াস!

অতনু!-শালা। ভাব মারে। নোঙর ফেলবে না। নোঙর তো শালা ঠিকই ফেলছস। বিয়াসের বিয়েটা হলেই টের পাবি কত গভীরে ছিল তোর নোঙর; শ্রেয়া বিড়বিড় করে আপন মেনই আওড়ায় আর হাসে।

১৭.

-আন্টি আজ রাতে আপনাদের বাসায় থাকব।
-থাকো। কি খাবে?
-বিরিয়ানি উইথ বোরহানি।
-সব হবে মা। যাও বিয়াস রুমেই আছে।
শ্রেয়া বিয়াসের রুমে যেতে যেতে শুনতে পায় গান-

রোদজ্বলা মন, দিলো ভিজিয়ে শ্রাবণ
সাদা মেঘ উড়ছে হৃদয় আকাশে
যখন, তখন; নতুন স্বপ্নে কাটে
দিন বিভোর, হিম হিম ভালোলাগা
লুকিয়ে তোমায় দেখা, পাগল
হাওয়ায় তোমার খবর
আমি নই আর একা

-কি রে নতুন গান?
-হ্যাঁ।

-দিলো ভিজিয়ে শ্রাবণ, না তাহসান? অতনুকে ঝেড়ে ফেললি?
-দেখ্ শ্রেয়া, আমি বিয়াস কিন্তু হিপোক্রিট কখনো ছিলাম না। তোর কি সন্দেহ হয় যে অতনু আমার ভালোলাগা কখনো বুঝেনি?
আমার অবস্থাটা একবার দেখ। আব্বার দু'বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তার উপর আম্মার নামটা দেখলেই তো মানুষের প্রশ্নের দৃষ্টি এফোঁড় ওঁফোড় করে ফেলে। যেন 'মল্লিকা চাকমা' মঙ্গল গ্রহের কোন জীব। আমরা আসলে কি তা তো আব্বা-আম্মা কেউই জানে না।
যে কোন ফরমে লিখি ধর্ম ইসলাম। আমি ঠিকভাবে নামাযও পড়তে জানি না। মনের গভীরে সংকটে একজনকে ডাকি। তিনি কে আল্লাহ,ভগবান, ঈশ্বর আমি কিসসু জানি না। বাবা-মা খুব বন্ধু। কিন্তু অতনুর কথা বলে বিয়ে ঠেকানোর আদৌ কি কোন মানে আছে?

-ওস্তাদ তুমি থামো। তুমি তাহসানের কোলে গিয়া ঘুমাও। দরজাটা আটকাও। বিড়ি টানুম।
-খবরদার আমার রুমেআর কিসসু টানবি না। অনেক সহ্য করেছি তোর এসব ধ্যাষ্টামো। আর কারও ফ্যামিলিতে প্রব্লেম থাকে না! তারা সবাই নেশা করে?

-আমার নেশায় বোরহান সাহেবের টাকা ফুরোবে না। তুই চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই রে বিয়াস।

-তুই কিসের সমস্যার জন্যে এমন করিস শ্রেয়া? আমার দিকে দেখ। ভালোবাসি এমন একজনকে যাকে কোনোদিন বলতে পারব না। বিয়ে করছি আরেক জায়গায়। তুই মাধুর কথা জানিস?

-না।
-তুই জানিস ওকে ম্যাট্রিকের সময় বাঙ্গালীরা তুলে নিয়ে গিয়েছিলো? আফটার থ্রি ডেজ শী কেইম ব্যাক! জানিস না। ডু ইউ নো মিহির ওয়াজ সিডিউজড বাই হিজ অ্যারাবিক টিচার? ডু ইউ নো হোয়াট রাতুল'স স্টেপ মাদার ডিড উইথ হিম? জানিস না। মুনের পরিবারের অবস্থা জানিস? তুই জানিস অতনু'র বাবা মা যে ওর চাচা চাচী হয়?

-না, না। বন্ধ কর।
-বন্ধ করব? কেন? ওরা কেউ নেশা করে? তোর মতো নিয়মিত?

-শূন্, জান্টু আজকে শেষবারের মেতা আমি তোর সাথে রাত কাটাতে আসছিলাম। হলো না।

শ্রেয়া ব্যাগ তুলে বের হয়ে যায়। বিয়াস নীরব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

-কোথায় যাও শ্রেয়া?
- আন্টি জরুরী ফোন বাসা থেকে।
- বিরিয়ানী?
-আরেকদিন, অন্যদিন...

## ১৮.

কুয়াশা -মেঘের জড়াজড়ি, পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে সবাই তাই দেখলো। লাস্ট পরীক্ষা, তারপর কে কোথায়, কে জানে? মাস্টার্সে কেউ থাকবে, কেউ থাকবে না। ফোন নাম্বার দেয়া নেয়া হয়। যদিও ওরা জানে ফোনগুলো বাজার সম্ভাবনা খুবই কম। তবু সাময়িক আবেগে কেউ কেউ কাঁদেও।

মুন অতনুদের মাইক্রোর পাশে দাঁড়িয়ে এসবই দেখতে থাকে। সবাইকে নিয়ে তুতুলদির বাসায় যাবার কথা। গাড়ী ভর্তি 'বে-পথু'র কপি। মুনের কাজ সবাইকে গরুর পালের মতো জড়ো করে নিয়ে যাওয়া। এই আখেরী আড্ডা আমতলা থেকে কখন ভাঙবে কে জানে! ইল্লিরে!- কঠিন কান্নাকাটি দেখা যাচ্ছে। কোথায় পায় এরা এত আবেগ?

- এই যে বিয়াস এদিকে গাড়ি।
- শ্রেয়া, শ্রেয়া, আজকে অন্যদিকে না, মাইক্রোতে উঠ। তোর জন্যে তুতুলদির বাসায় সবকিছুর ব্যবস্থা থাকবে, কথা দিলাম।
- মাধু, মাধবী এই যে আমরা সবাই, বিয়াস হাঁকে।
- দেরী করে ফেললাম? রাতুল্ মিহির জিজ্ঞেস করে।
- আমি ডাইরেক্ট যাব। মাধবীর মোবাইলে তপুর এসএমএস।
- আব্বা অসুস্থ। আসতে পারবে না, পুনম বায়রনের খবর বলে।
- চল যাওয়া যাক। মুনের কথায় সবাই গাড়ীতে ওঠে।

মাইক্রোর সামনে বসে নিজেকে কেমন যেন মুনের গার্ডিয়ান গার্ডিয়ান লাগে।

বিয়াস এই প্রথম কোথাও যাচ্ছে যেখানে ও আর শ্রেয়া পাশাপাশি বসেনি। শ্রেয়ার সাথে ওর বন্ধুত্বটা সবসময় সঙ্কটের কারণই হয়ে থাকলো। বিয়াস আড়চোখে শ্রেয়ার দিকে তাকায় আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কি চেহারা হয়েছে! আল্লাহ তুমি শ্রেয়াকে ভালো করে দাও - বিয়াস মনে মনে নীরব প্রার্থনা করে।

বেটি, পরীক্ষার এত ধকল সত্বেও এমন সুন্দর কেমন করে হচ্ছে? বিয়াসের দিকে একনজর তাকিয়েই শ্রেয়ার এই কথাটাই মনে আসে। আসলেই কি মেয়েরা বিয়ের আগে আগে সুন্দর হয়ে যায়? না কি শ্রেয়া এতদিন বিয়াসের দিকে খোলা দৃষ্টিতে তাকায় ই নি।

সবাই ম্যাগাজিন দেখায় ব্যস্ত।

বিয়াসের ইতি উতি তাকানো দেখে শ্রেয়া অনেকটা অভ্যাসবশেই বলে ফেলে অতনু তুতুলদির বাসাতেই আছে। ভোবে না খুঁজলেও চলবে।

বিয়াস নিঃশব্দ হাসিতে শ্রেয়ার দিকে তাকাতেই দু'বন্ধু অনেকদিনের জমে থাকা মেঘ সরিয়ে  কে অন্যের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

-এই নাম্ নাম্। স্ট্রেইট পাঁচ তলার বাঁদিকের ফ্ল্যাটে চলে যাবি। লিফট বাঁ পাশে। সবাইকে ডিরেকশন দিয়ে মুন খাবার নামাতে থাকে গাড়ি থেকে।

১৯.

তুতুলের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনে আজকে অনেকদিনপর সবুজ বাতাস, পল্লব হুড়োহুড়ি করছে। অতনুসহ ওর এত বন্ধুদের একসাথে দেখতে পেয়ে ওর তেমনই লাগে।

- ইস্, তুতুলদি তুমি এরকম হয়ে গেছ কেন?
- কেমন?
- এই যে তোমার চোয়াল ভেঙ্গে কি অবস্থা!
- শ্রেয়া, তোর এই অবস্থা কেন? আমার তো না হয় বয়স বাড়ছে, জীবনে এত বড় একটা ঝড়, তোর কি?

এইসব তত্ত্ব কথা পরে হবে। একবার তো সবাই ঢুকি। মুন শ্যেয়া-তুতুলে কথা থামিয়ে খাবার নিয়ে ভেতরে ঢোকে।

-তোরা বসে পড়, ঐ যে বাঁয়ে বাথরুম, কেউ ফ্রেশ হতে চাইলে হয়ে নে। আমি খাবার দেবার ব্যবস্থা করি। পরীক্ষা দিয়ে তোরা নিশ্চয়ই সবাই ক্ষুধার্ত।

- কি সাজাইছে রে! মুন বিস্মিত হয়।
- এই কি দেখছো বাছাধন, ডেবরুম দেখলে আর বের হইতে চাইবা না। আলো ফেলে চারপাশ থেকে কেমন যেন স্বপ্ন সৃষ্টি করে ফেলে দিন-রাত যে কোস সময়েই। শ্রেয়া সবার অবগতির জন্যে বক্তব্যটুকু দিয়েছে এমন ভাব করে সবার দিকে তাকায়। ওর ভাবে মনে হচ্ছে - দেখতে হবে না কার বোন! আমার বোন তো, এক্সট্রাঅর্ডিনারী কাজ তো তাকেই মানায়।
- এটা কি রে? প্যারিসে, যেখান থেকে ফাইন আর্টসে ডিগ্রী নিয়েছে সেখানকার পুরস্কার। বিদেশী স্টুডেন্টদের মধ্যে সবচাইতে ভালো করাতে এই সম্মানসূচক সার্টিফিকেট।
- ইল্লিরে! তুই এমনভাবে বলছিস যেন ফ্রেঞ্চ ল্যাংগুয়েজে লেখা যে কোনকিছু পড়া তোর জন্যে কোন ব্যাপারই না! মিহির হাসতে হাসতে বলে।
- না, দিদি আমাকে পড়ে একদিন শুনিয়েছে।
- চল না আমরা ভেতরে যাই, দিদিকে হেল্প করি।

বিয়াসের কথায় মেয়েরা এবং মিহির ভেতরে যায়।

- অতনু, তোর পছন্দ আছে রে! রাতুল সপ্রশংস দৃষ্টিতে অতনুর দিকে তাকিয়ে শব্দ কলে।
- কেন?
- ভাইরে, কি ফিগার, কি স্মার্ট। কথা বলার ভঙ্গী কি! উফ্! মনে হয় গালি দিলেও শুনতে ভালো লাগবে। এই মানুষকে কোন পুরুষ জেনেশুনে ডিভোর্স দিতে পারে, আই কান্ট বিলিভ।
- শালা, চুপ কর, শুনে ফেললে কেলেংকারি হবে।

- আরে মিহির মহিলাসহ মেয়েরা ভেতরে গেছে, এত তাড়াতাড়ি কি আর আসবে! তপু হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাওয়ার অবস্থা। এই অবস্থাতেই ও রাতুলের দিকে হাত তুলে বলে, দোস্ত ক্ষমা করিস। আফটার অল, তোর বউ, ঐ মিহির, ছেলে হয়েও। আমি তোকে হার্ট করার জন্যে কিছু বলতে চাইনি।
- না রে, এখন আর দুঃখ পাই না। আমরাও ভাবি রে, আমাদের দুজনের ভাগ্যে কি আছে শেষ পর্যন্ত ।
- আল্লাহর ওয়াস্তে কোন সিরিয়াস ম্যাটার আলাপ করা শুরু করিস না। দেশ ছেড়ে ভাগ, এটা বাইরের দেশে কোন ব্যাপারই না। নিজেদের মতো করে বাঁচ। এখানে তো তোদের কোন হাত নেই। এতো বেশি হীনমন্যতায় না ভুগলেই হয়। মুন রাতুলের আক্ষেপে সান্ত্বণার আশ্বাস দেবার প্রয়াস পায়।

ভেতরে খাবার গরম করা সাজানোর সাথে গল্পের তুবড়ি কম ছোটে না। বিয়াস-শ্রেয়ার প্রায় তিনমাসের জমানো গল্প একসাথে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা চালাচ্ছে।
মিহির এক একটা জিনিস দেখছে, আর আল্লাহ দি িদ কি অদ্ভূত, কি সুন্দর বলে লীলায়িত ভঙ্গীতে পুরো ডাইনিং এ একরকম নাচছে।

বিকেলের আগে আগে ওদের সবার খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যায়।

সন্ধ্যা নামছে যখন তখন বিয়াস মুরু করেছে গান গাওয়া ু শচীন দেবের গান দূর কোন পরদেশে তুমি যাইবা ...

অতনু ভাবে বিয়াস বুঝি নিজের যাবার কথাই এভাবে বলছে। বিয়াস ওকে ছেড়ে চলে যাবে তাহসান নামক এক যুবকের সাথে এটা ভাবতেই কেমন যেন স্বপ্নের মতো লাগে অতনুর কাছে। অতনু ভেবেছিলো এই মেয়েটা বুঝি তার জরুরী নিস্প্রয়োজনীয় সব কথা সবসময় একধ্যানে শুনে যাবে। ওর পাশে পাশে হাঁটবে ওর আধ খাওয়া বিড়িতে শেষ টান দেবার জন্যে। অতনুর ইদানীং নিজেকে সত্যিই ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

গানের ফাঁকে বিয়াস অতনুর দিকে তাকায় একাবর, আহা! রোগা ছেলেটা আরও যেন মিলিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছে! ক্ষমা করিস, বিয়াস খুব
সন্তর্পণে শব্দগুলি উচ্চারণ করে।

-তোমাদের গ্রাজুয়েশন ধরতে গেলে শেষ, এই অনারে আমি আজকে তোমাদের একটু পান করার অনুমতি দিলাম। যে যেটা খাও- এটা হুইস্ক। উম্, এটা ভদকা, আর এটা জিন॥ নবিসরা এই জিনিস না খাওয়াই ভালো- তেনার নাম ট্যাকুইলা।
তুতুলে শেষ কথাটা বলার ভঙ্গীতে সবাই একচোট হেসে নেয়।

শ্রেয়া লোভাতুরের মতো হুইস্কির বোতলটা টেনে নিয়ে কখন অন্যরুমে চম্পট তা গানের গোলে কেউ খেযালও করে না।

- থ্রি চিয়ার্স ফর তুতুলদি, হিপ হিপ হুররে বেল সবাই একযোগে চিয়ার্স করে।

আটটা, সাড়ে আটটা এবার আসর ভাঙ্গার পালা। সবাই বুঝতে পারে।
-খুব ভালো লাগলো, আবার এসো। কি বিয়াস বিয়েতে আমকে ডাকবি তো! তোর হলুদের স্টেজটা আমি আর অতনু মিলে করে দিব।
তুতুলের কথায় বিয়াস একটু লজ্জা পেয়ে হাসে, সম্মতির হাসি।
-বায়রন এলো না। ওর ম্যাগাজিন আর ও ই দেখতে পারলো না প্রথম দেকাটা। ওর বাবার একবার খবর নিতে হবে। আমাকে ওর কনটাক্ট নাম্বারটা দিস তো।
তুতুল অতনুর দিকে তাকায়।

- এই আমি মাধবীকে বাইকে পৌঁছে দিব হলে, তোরা চলে যা। তপু মুনের দিকে তাকি য়ে বলে।
- আমার তো এখানেই বাসা। এমনিই চলে যেতে পারবো। আমাকে নামিয়ে দেয়া লাগবে না। পুনম নিজের দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নেয়।
- এই শ্রেয়া কোথায়? ও যাবে না!

বিয়াসের কথায় সবার টনক নড়ে। শ্রেয়াকে বিয়াসের গেস্ট রুমে বোতল জড়িয়ে ঘুমানো অবস্থায় আবিষ্কার করে সবাই।

- ও থাকুক আমার কাছে। আমি ওর বাসায় ফোন করে দিব। তোরা যা।

আনন্দ ভাঙ্গে, ভাঙ্গে মিলন মেলা। প্রাপ্তি, হর্ষ, বিষাদ বিচিত্র সব অনুভূতি নিয়ে ওরা পা বাড়ায় যে যার পথে।

## ২০ : পরিশেষ

শ্রেয়ার মা আর জার্মানী থেকে ফেরেনি। সেখান থেকেই বোরহান সাহেবকে উনি ডিভোর্স দিয়েছেন। ঐ তো শ্রেয়া রাস্তা ক্রস করছে, বাহ্ মেয়েটাকে তো অনেক ফ্রেশ লাগছে!

একি এ তো দেখা যাচ্ছে তুতুলের বাসা। হ্যাঁ, শ্রেয়া ঐ রাতের পরে আর বাসায় ফেরেনি। তুতুলের কাছেই থাকে। নেশাখোর শ্রেয়া এখন নামি ইংরেজী পত্রিকার দামি রিপোর্টার।

তুতুলের বাসায় একটাও বোতল নেই। বোনকে ফেরাতে গিয়ে তুতুলও দেখা যায়...

সুইটজারল্যান্ডে এরা কারা? কেমন যেন চেনা চেনা লাগে!- ওহ্, হো এতো দেখা যাচ্ছে রাতুল আর মিহির। রাতুলের শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে পরম আদরে মিহির।

বিয়াসের মতো নাক -চোখের একটা মেয়ে বরফের বল বানিয়ে ছুঁড়ছে দারুণ হ্যান্ডসাম এক ছেলেকে। ছেলেটা হাসতে হাসতে মেয়েটাকে বাসায় যাবার কথা বলছে, বার বার বলেই যাচ্ছে বিয়াস নদী আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে জমে যাবে, জমাট নদী মোটেই ভালো লাগবে না। আমরা ধরে নিচ্ছি বিয়াস তার তাহসানকে নিয়ে নিউইয়র্কে বেশ ভালোই আছে।

এটা কে, কাঁধে ধোপদুরস্ত ব্যাগ, মোটা বিনুনি, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। এ যে পুনম! পুনম এখন ব্যস্ত গায়িকা। যদিও গ্রুপে সবাই বিয়াসের গানই বরাবর শুনে আসছে। বলতে নেই বিয়াসের অনুমতিক্রমে বিয়াসের লেখা আর সুর করা গান গেয়েই পুনম আজ নামি গায়িকা।

শেষ বিকেলে পুনমের পাশে অকালে বয়স্ক হয়ে যাওয়া ছেলেটা কে? বায়রন। ওরা বুঝি পাশাপাশি হাঁটছে?

- হুঁ
- ওরা কি জীবন পথেও এভাবে হাঁটবে?
- সেই সম্ভাবনাই প্রবল। বায়রনের বাবা মারা যাওয়াতে ও একটু বেকায়দায়। বাবার ব্যবসাটা গোছাতে পারলেই ও পুনমকেও গুছিয়ে নিজের করে নেবে। এমনই কথা হচ্ছে ওদের দুজনে।

তপুর বাইকে সেই যে শেষ আড্ডার দিনে মাধবী উঠেছিলো এখনো সেই জয় রাইড শেষ হয়নি। মাধু ইউএনডিপি তে বেশ ভালো একটা প্রোজেক্টে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। তপু, তপু কি করে?

নাহ্, তপু আর রাজনীতির সেই বেনোজলে ঘুরপাক খাচেছ না। ও রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ইতিমধ্যে খুব ভালো করেছে। দারুণ চলছে ওর দেয়া ওস্টোর্ন খাবারের রেস্টুরন্ট।

অতনু কি সবাইে ক ভুলে গেছে? না কি অতনু কে সবাই?

খুবই দুষ্কর উত্তর দেয়া। তবে প্রকৃতিকে অতনু ভোলেনি এ কথা হলপ করে বলা যায়। সেন্টমার্টিনে করা অতনুর বাবার হোটেলে যে তামাটে হয়ে যাওয়া ছেলেটা একমনে ছবি আঁকছে সে অতনু ছাড়া আর কেউ নয়। গত আঠারো মাস এই ছেলে ঢাকামুখো হয়নি।

এখানকার মানুষেরা বলে, ও, আঁকার স্যার! খুব ভালো মানুষ। প্রায়ই ছকি আঁইকা আবার সাগরে ভাসায়ে দেয়। দেখলেই মনে হয় কেমন যেন জ্বালা তার অন্তরে।

অতনুর সাগর ভালো লাগে না। ওর একটা নদী দরকার, যে ওর এই জ্বালা শান্ত করবে। যাতে স্নান করলে ওর তপ্ত মনোদেহ শীতল হবে। সাগরে উন্মাদনা, স্বস্তি নেই। ওর বড্ড শান্তি দরাকার। মাতৃগর্ভের নিশ্চিন্তির মতো আশ্রয়।

যেদিন আকাশ জুড়ে থাকে নক্ষত্রদের উজ্জ্বল কনফারেন্স, সেদিন পুরো সৈকতে আঁকার স্যার সারারাত চুপ করে বসে থাকে আর গান গায় 'কিছু ভুল ছিল তোমার, কিছু আমার...' দেড়বছরে এই এক গানই সবাই তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইতে শুনেছে।

রাতের আকাশ, দিনের সমুদ্র সৈকত, তুলি ক্যানভাস সবাই জেনেছে অতনু'র একটা নদী ছিলো। শুধু অতনুর জানতে বড় বেশি দেরী হয়ে গিয়েছে।

শ্যেয়া তুতুলের সামনে একাটা চিঠি নিয়ে বসে আছে - পুরো পাতাজুড়ে একটা মাত্র লাইন

- আমাকে একটু আশ্রয় দেয়া যায়? হ্যাঁ বললে ঢাকা ফিরব। অতনু

অতনু আপাত শান্ত কিন্তু আদপে খরস্রোতা নদীতে খুব সাবধানে পা ফেলে হাঁটছে এটা পুরো ঢাকা শহর বিস্ময় নিয়ে দেখে।

আমরাও দেখি শ্রেয়া-অতনুকে ওদের বাসর রাতের জানালায় ঝুলে থাকা আকাশে তারাদের খুনসুটিতে, মেয়ে তারাটা কি এক অতীত ভাবনায় খুব দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে মধুরাতের বুকে। দূর পরবাসে সেই শ্বাস ঘুরপাক খায় অনেক অনেক কাল...